ষষ্ঠ অধ্যায়

নারীর লেখায় নারীর ভাষা

মানুষ নিজের ভাব ও চিন্তাকে অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে আশ্রয় নেয় 'ভাষার'। কাজেই বলা যায় পারে মানব মনে আশ্রিত নানা অনুভূতি, চিন্তন অন্যজনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তাগিদেই ভাষার জন্ম। ভাষা মানুষকে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। ভাষাবিজ্ঞানী চার্লস এফ হকেট আধুনিক ভাষা বিজ্ঞান বিষয়ক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে ঠিক একই কথাই বলেছেন—

> *"ভাষা হল মানুষের এমন এক অভিজ্ঞান যা অন্য প্রাণী থেকে তাকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।"*[১]

ভাষার উন্মেষ মানুষের মনে, একের পর এক চিন্তাধারা যখন মানুষের মনে আবির্ভূত হয় তখন সেই চিন্তাই প্রকাশ পায় ভাষারূপে। চিন্তা ও ভাষার যোগসূত্রটি সম্পর্কে প্রতীচ্যের আদি আচার্য প্লাতো বলেছেন—

> *"চিন্তা ও ভাষা মূলত একই; পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, চিন্তা হল আত্মার নিজের সঙ্গে নিজের নীরব কথোপকথন, আর যে প্রবাহটি আমাদের চিন্তা থেকে ধ্বনির আশ্রয়ে ওষ্ঠের মধ্যে দিয়ে বয়ে আসে তাই হলো ভাষা।"*[২]

মানুষের ভাষা সৃষ্টির মূলে দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ নিজের ভাব-বিনিময়ের জন্য দ্বিতীয়তঃ সমাজবদ্ধ মানুষের ভাব বিনিময়ের তাগিদে অর্থাৎ সমাজের অন্তর্গত মানুষের একে অন্যের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের প্রয়োজনার্থে ভাষার সৃষ্টি। তাই ভাষাবিজ্ঞানী হুইটনির মতো আমরাও বলতে পারি "ভাষা হচ্ছে সামাজিক সংস্থা— **Language is a social institution.**"

বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী স্টাটেভাণ্টও ভাষার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন—

> ***"A language is a system of arbitrary***

vocal symbols by which members of a social group co-operate and interact." [৩]

ভাষা হচ্ছে মানুষের বাগযন্ত্রের মাধ্যমে উচ্চারিত বিভিন্ন ধ্বনির সম্মিলিত রূপ। তবে যে কোনো ধ্বনিই ভাষা হতে পারে না। যেমন— জীবজন্তুর কণ্ঠস্বর, মানুষের করতালি ইত্যাদি। আবার যে সব ধ্বনি উচ্চারিত হয় মানুষের বাগযন্ত্রের মাধমে তাকেও ভাষা বলা যায় না। যেমন— শিশুর অস্ফুট চিৎকার, পাগলের অর্থহীন ধ্বনি প্রভৃতি। ভাষার দুটো রূপ প্রথমতঃ সাহিত্যের ভাষা দ্বিতীয়তঃ মুখের ভাষা। এই মুখের ভাষাই সাহিত্যের ভাষারূপে পরবর্তী সময়ে স্থান পেয়েছে। বীরবল ছদ্ম নামে খ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীই প্রথম বলেছিলেন মুখের ভাষাই হবে সাহিত্যের ভাষা। তাঁর এই কথাকে সমর্থন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা সাহিত্যে মেয়েলি ভাষারূপে আরেক ধরনের ভাষাভঙ্গিমার সন্ধান পাওয়া যায় বিশ শতকের লেখিকাদের লেখনীতে।

বাঙালি মেয়েদের জীবন সীমাবদ্ধ ছিল অন্তঃপুরের চারদেওয়ালে। যাদের জন্য সমাজ নির্ণীত করে রেখেছিল এক অন্য জগত। যেখানে নেই স্বাধীনতা, শিক্ষা। শুধু পুরুষের আধিপত্য, নারী-পুরুষের ভেদাভেদ আর নিয়ম নীতির প্রাচুর্য। সেই সামাজিক অবস্থানে অন্তঃপুরিকাদের মনস্তত্ত্বে ভাবনা, জিজ্ঞাসা ও আত্মপরিচয়ের অন্বেষণের জন্ম দেয় যার প্রতিফলন ঘটে তাঁদের ভাষাতেও। সে সময়ের কিছু লেখিকারা সেই অন্তঃপুরের নারী সমাজের ছবি আঁকতে গিয়ে তাঁদের প্রাত্যহিক কথাবার্তা, ঈর্ষা জড়ানো উক্তি-প্রত্যুক্তি, এছাড়া তাঁদের ব্যবহৃত শব্দাবলী, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচনকে তাঁদের লেখনীতে তুলে ধরেন যা 'মেয়েলী ভাষা' বা 'নারীর ভাষা' রূপে চিহ্নিত হয়।

'নারীর ভাষা' বা **'Woman's Dialect'** বিষয়ে প্রথম আলোচনা করেন অটোয়েসপারসন তাঁর **'Language'** বইয়ের **XII** পরিচ্ছেদে। এছাড়া মেয়েদের উপভাষা ব্যবহার নিয়ে আলোচনা রয়েছে **Dominican Breton** এর

'Dictionnaire Caraibe Francais' (1664) বইয়ে। বাংলায় উইলিয়াম কেরী 'কথোপকথন' (১৮০১) বইতে সম্ভবত প্রথম মেয়েদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ১৮৭২ সালে সারদাচরণ মিত্র, ১৯৭০ সালে নির্মলদাস 'উত্তরবঙ্গে নারীর ভাষা' নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। এছাড়া সুকুমার সেনও 'বাংলায় মেয়েদের ভাষা' (১৯৭৯) নামে একটি বইও লেখেন। মেয়েদের ভাষায় মেয়েলি ভাষা ভঙ্গিমা গড়ে ওঠার পেছনে কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ—

বাঙালি সমাজে নারী ও পুরুষ যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর দুই প্রাণী। পুরুষদের জন্য শাস্ত্রকাররা কোন বিধি-নিষেধ দেননি। অন্যদিকে নারীর জীবন নানা নিয়মনীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ। প্রাত্যহিক নিরন্তর কর্মব্যস্ততাতেই আজীবন অতিবাহিত। তা সে কন্যা, জায়া, জননী যেই হোন না কেন নারীর অবস্থান সেই একই অন্তঃপুরে। সেই দমবন্ধ শিক্ষাহীন পরিবেশে নির্বাক পুতুলের মতো আজীবন কাটাতে হয় তাদের। সেই অন্তঃপুরিকাদের বচনমালাই উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম বহন করে নিয়ে চলে। সুতরাং মেয়েদের ভাষা পুরুষদের ভাষা থেকে আলাদা হবার পেছনে রয়েছে মূলত এই সামাজিক অবস্থান।

পরিবার বা পারিবারিক গঠনের ওপর ভিত্তি করে নারীর ভাষায় মেয়েলি ভাষাভঙ্গিমা দেখা দেয়। নারী যদি অভিজাত পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠে তবে তাঁর ভাষায় 'মেয়েলি ভাষাভঙ্গিমা' চিহ্ন মুক্ত থাকে। যেমন দেখি স্বর্ণকুমারীদেবীর মধ্যে। অভিজাত পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠায় তাঁর ভাষায় মেয়েলি ভাষা ভঙ্গিমার পরিচয় বিশেষ মেলে না। তেমনি আশালতা সিংহের লেখনীতেও।

মেয়েদের ভাষায় নিজস্ব গড়ন তৈরী হওয়ার মূল কারণরূপে বলা যেতে পারে সমাজে নারী-পুরুষকে দেখার ভিন্নতা। ভাষাবিজ্ঞানী অটোয়েসপারসন, রবিন লেকফ, ড০ সুকুমার সেন প্রত্যেকেই মনে করেন মেয়েদের ভাষায় নিজস্বতা গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে সমাজে নারী-পুরুষ বিভেদের মনোভাব। সমাজে নারী ও পুরুষের ব্যবধান বহুদিন ধরেই। শুধু বাংলার সমাজ বললে ভুল হবে

সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায়ও প্রযোজ্য। সেকালের বাঙালি মেয়েরা কলুর বলদের মতো একহাত লম্বা ঘোমটা দিয়ে দিবারাত্রি গৃহকর্মে নিরলস খেটে যায়। যাদের এর বাইরে কোন জগত ছিল না। তাদের শেখানো হত স্বধর্ম বলতে স্বামীসেবা। এমনকি, সমাজ তাদেরকে শিক্ষার অধিকার থেকেও বঞ্চিত করে রেখেছিল। সমাজে সর্বত্রই ছিল নারী-পুরুষের এই ভেদাভেদ।

ছোটবেলা থেকেই নারীর মনে কিছু-কিছু শিক্ষা বা ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হত। যা মেয়েদের মনোলোকে চিরকালই গেঁথে থাকত। যেমন— কোনো বাচ্চা মেয়ে উচ্চ এবং কর্কশস্বরে কথা বললে তাঁকে সঙ্গে-সঙ্গে মা বকুনি দেন কারণ সমাজে মেয়েদের ভাষা বলতে মৃদু গলায় কথা বলাকে মেনে নেওয়া হয়। সুতরাং এই কারণেও মেয়েদের ভাষা 'মেয়েলি ভঙ্গিমায়' পরিণত হয়।

এছাড়া ছোটবেলা থেকে দেখা যায় পুত্রের চেয়েও অধিক সময় অতিবাহিত করে মেয়েরা তাঁর মায়ের সঙ্গে। এর ফলে অন্তঃপুরের নিয়মনীতির বন্ধনে বন্দী মার আচরণ, বাগভঙ্গিমা মেয়েদের মধ্যে দেখা দেয়।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন লেখিকারা আপন লিখন বৈশিষ্ট্য নিয়ে পাঠকহৃদয়ে আসীন। কাহিনি বর্ণনায় তাঁরা প্রচলিত মান্যভাষা ব্যবহার করলেও তাদের মধ্যে কারও-কারও রচনায় মেয়েলি ভাষা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

তৎকালীন পুরুষপ্রধান সমাজ নারী ও পুরুষের জন্য যে দ্বিবিধ নিয়মনীতি তৈরী করে রেখেছিল এর ফলে পুরুষ ও নারীর জীবনচর্যায় দেখা দিয়েছিল বৈপরীত্য। পুরুষ নিজেকে মেযেদের থেকে সকল বিষয়েই সর্বজান্তা মনে করতে থাকে। তৎকালীন পুরুষপ্রধান সমাজে কোনো না কোনো ভাবে মেয়েরা হচ্ছিল অবহেলিত, লাঞ্ছিত। ফলে নারীর এই অবস্থান প্রভাব ফেলে তাঁর ভাষাতেও। নারীর স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার না থাকার জন্য তাঁদের কথা বলতে কখনও ভয়, ইতস্তত আবার কখনো অসম্পূর্ণ বাক্যের ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন—

"মা চলে গেলে আর চিলেকোঠায় কেন? বিরাজ
অবাক হয়, 'দোতালার ঘরেই তো—' "

সেকালের মেয়েদের শিক্ষা ও সচেতনতা কম থাকায় তাঁদের ভাষায় সহজীকরণ পদ্ধতি দেখা যায় যেমন— মেয়েরা বলে থাকে বোনকে বুন বা বহিন। স্বামীকে — সোয়ামী, কুরুক্ষেত্রকে— কুলুক্ষেত্র, তাচ্ছিল্যকে— তাচ্ছীল্যি, ভট্টাচার্যকে — ভচচায্যি প্রভৃতি। যেমন—

ক) ওটে বুন সেদিন কলাঘাটার হাটে গিয়াছিলাম তাহাতে দেখিয়াছি সুতার কপালে আগুন লাগিয়াছে। *('কথোপকথন', পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন (১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮/১)*

খ) ...শুনতে পেলে এখনই মহা কুলুক্ষেত্র লাগিয়ে দেবে। *('সমাজ', রমেশ রচনাবলী উপন্যাস, সা সং সং ৪৭২/২৩)*

গ) আমার সঙ্গে ঠাট্টা— আমাকে তাচ্ছীল্যি! *('বাবু', অমৃত গ্রন্থাবলী(৩), বসুমতী, সং ১৯/১/৩৪*

ঘ) চিরকালের অস্পৃশ্য যারা, আজ তোমার বিচারে তারা হবে ভচ্চায্যি বমুন। *(ঘূর্ণি হাওয়া', প্রভাবতী দেবীর গ্রন্থাবলী, বসুমতী, সং ১০১/১/৪১*

রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থায় নারীর স্বধর্ম বলে নির্ণীত স্বামীসেবা। স্বামীর সকল মতামতকে স্ত্রীর সম্মান জানানই ছিল প্রধানকর্ম। নারীর জন্য সেকালের সমাজে নির্দিষ্ট কিছু বিধিনিষেধ ছিল। এর মধ্যে একটি হল স্ত্রীদের স্বামীর নাম উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ ছিল। ফলে সে অবস্থায় নারীরা স্বামী শব্দের বা তাঁর নামের পরিবর্তে 'এ' এবং 'ও' ধ্বনি দুটিকে সর্বনাম শব্দ হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। এছাড়াও স্বামীর নামের পরিবর্তে ডাকতে শোনা যায় 'ওগো শুনছনি', 'ওগো কই', বা 'এই যে শুনছ'। উল্লেখ্য যে, শ্বশুর, ভাশুর বা এই ধরনের কারো নাম বলার ক্ষেত্রেও মেয়েদের নিষেধাজ্ঞা ছিল। ফলে বাংলায় মেয়েদের

ভাষায় 'ধ্বনি বিকল্পন' এর ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যায়। স্বামী বা ভাশুর কারো নাম যদি 'কালীমোহন', 'কালীভূষণ' বা 'কালীচরণ' হয় সেক্ষেত্রে একজন মেয়ে বলবে 'কালীসিংহের মহাভারতকে' ফালীসিংহের 'মহাভারত'। ভাশুর বা স্বামীর নাম 'দুর্গাচরণ', 'দুর্গামোহন' বা 'দুর্গাদাস' হলে 'বড়ঠাকুরণ' বা ঠাকুরণের পূজা বলতেও শোনা যায়।

রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে শিক্ষার অধিকার থেকেও বঞ্চিত করে রেখেছিল। সমাজে নারীর শিক্ষার্জন নিয়ে কিছু ভ্রান্তিমূলক ধারণাও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যেমন— মেয়েরা পড়াশুনা করলে নৈতিক অবদমন ঘটবে, বিধবা হবে, ইত্যাদি। ফলে দেখা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে অন্তঃপুরিকারা পিছিয়ে থাকার কারণে পুরুষদের মতো নতুন-নতুন শব্দ বা অন্যান্য ভাষার শব্দ প্রয়োগ তাদের ক্ষেত্রে অসম্ভব ছিল। ফলে নারীর শব্দভাণ্ডার ছিল পুরুষদের তুলনায় সীমিত। এই শব্দ ব্যবহারই মেয়েদের ভাষাকে পুরুষদের ভাষা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। ভাষাবিজ্ঞানী য়েসপারসন, সুকুমার সেন উভয়েই এই একই কথা বলেছেন। অন্তঃপুরিকাদের ভাষায় গালাগাল বাচক শব্দ বেশী প্রয়োগ হতে দেখা যায়। কিন্তু পুরুষদের ভাষায় সে সব শব্দাবলীর ব্যবহার হয় না। 'পোড়া' শব্দটি দিয়ে গালি তৈরী করতে মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় যেমন— 'পোড়ামুখী', 'পোড়াকপাল', 'পোড়ামুখ', 'পোড়াকপালী' ইত্যাদি। অন্তঃপুরিকাদের ভাষায় 'পোড়া' শব্দটি খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঠিক একই অর্থে 'কালা' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়। যেমন— 'কালামুখ', 'কালামুখী' ইত্যাদি। এছাড়া 'সোহাগী' শব্দটিকেও গালি বা শ্লেষ হিসেবে ব্যবহার হতে দেখা যায়। যেমন— 'বাপসোহাগী', 'স্বামীসোহাগী', 'ভাইসোহাগী' ইত্যাদি। উল্লেখ যে মেয়েদের ভাষায় এ ধরনের আরও কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয় যেমন— 'আঁটকুড়ী', 'অভাগী', 'মাগী', 'ইতর', 'অস্পদ্দাবাজ', 'লক্ষ্মীছাড়ী', 'ছারকপালী', 'গোমড়ামুখী' ইত্যাদি। মেয়েদের ভাষায় কিছু বিশেষ শব্দ বা বাক্যাংশের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। যেমন— 'ধ্যাৎ', 'মরণ', 'ব্যাং', 'ছাই', 'যা', 'মায়া', 'বাবারে বাবা', 'ভালো

হবে না বলছি', 'মাগো মা', 'দুষ্টু কোথাকার' ইত্যাদি।

(ক) বাবারে বাবা এমন দুষ্টু ছেলেতো, আর কোথাও দেখিনি।

(খ) ভালো হবে না বলছি, আমার কথা ব্যঙ্গ করলে।

(গ) মাগো মা এমন ছিষ্টিছড়া মেয়েকে নিয়ে পারা গেল না।

(ঘ) ধ্যাৎ ব্যাং কাল থেকে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে, ঘর থেকেও বেরোনো যায় না।

লোক সাহিত্যের একটি বিভাগ ছড়া। 'ছড়া' মুখে মুখে রচিত হয়ে প্রজন্ম পরম্পরায় চলতে চলতে এসে গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। সেকালের মেয়েদের মুখে বিশেষ করে এই ছড়ার ব্যবহার দেখা যায়। এছাড়াও ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারার প্রয়োগ সেকালের মেয়েদের ভাষাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। উল্লেখ্য যে, সেকালের মেয়েরা 'গোপন ভাষা' বা **'Code Language'** ব্যবহার করত। ভাষার সাহায্যে একজনের মনের কথা অন্য জনের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। কখনও আমাদের মনের কথা অন্য ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিতে গিয়ে যাতে সবার সামনে জাহির না হয়, সেই প্রবণতা থেকে সৃষ্টি হয় 'গোপন ভাষা' বা **'Code Language'** । সেকালের মেয়েদের ভাষায় ট্যাবুর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কখনও কখনও কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে এমন ধারণার সৃষ্টি হয় যা সেই বস্তু বা ব্যক্তির নামোচ্চারণ বিষয়ে আমাদের মনে এক ধরণের সংস্কার নির্মিত হয়। এই সংস্কারের দ্বারা মেয়েরা বেশি প্রভাবিত হয়। এমন অনেক শব্দ আছে যা উচ্চারণ করতে নেই, মেয়েদের ধারণায় তাতে অমঙ্গল হতে পারে বা দুর্ভাগ্যকে টেনে আনে তাই এই অমঙ্গল বা দুর্ভাগ্যকে এড়াতে গিয়ে মেয়েরা বিপরীত অর্থবাচক শব্দ প্রয়োগ করে। ইহাকে সুভাষণ বলা হয়। সুভাষণকে 'ট্যাবুর' অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন ''শাঁখা খুলে নেওয়ার' পরিবর্তে বলা হয় 'শাঁখা বা নোয়া শিথলান'। বাঙালি সমাজে বৈধব্য ঘটলে

মেয়েদের শাঁখা খুলে নিতে হয়, তাই মেয়েরা শাঁখা খুলে নেওয়া বলাকে অমঙ্গল ভেবে 'শিথলান' শব্দটি প্রয়োগ করে। 'ট্যাবু' হল সামাজিক সংস্কার। এই সংস্কার ভাষাতেও পরিবর্তন ঘটায়। মেয়েদের ভাষায় 'নেই' এর বদলে 'বাড়া', 'যাওয়ার' বদলে 'আসা' ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করতে দেখা যায়। মেয়েদের বিশ্বাস এ ধরনের ক্রিয়া ব্যবহারে অমঙ্গল বা বিপদ এড়ানো সম্ভব। উল্লেখ্য যে, বাড়ীতে চাল শেষ হয়ে আসলে, গৃহিণী বা বাড়ীর কর্তৃরা চাল শেষ বলেন না, বলেন 'চালবাড়ন্ত'। ঠিক সিঁদুরের ক্ষেত্রেও ফুরিয়ে আসার বদলে বলা হয় 'সিঁদুর বাড়ন্ত' এরূপ ক্রিয়াগত বিকল্পন পদ্ধতি মেয়েদের ভাষায় এমন কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে যা পুরুষদের ভাষায় খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। তবে ট্যাবুকে এক ধরনের কুসংস্কার বলা যেতে পারে।

অন্তঃপুরের প্রচলিত শব্দাবলী, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, বাগধারা, ট্যাবুর ব্যবহার মেয়েদের ভাষাকে পুরুষদের ভাষা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। এসব বিষয়ের সমন্বয়েই মেয়েলি ভাষা বা নারীর ভাষা গড়ে ওঠে। বিশ শতকের শুরুতে বাংলা সাহিত্যে মেয়েলি ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। এরপর মেয়েরা যতই অন্তঃপুর থেকে বেরিয়েছে বহির্জগতে, ততই তাঁদের চিন্তা-ধারায় নতুন অভিজ্ঞতা মিশেছে। ফলে তাদের লেখার ভাষায় মেয়েলি ভাষা ভঙ্গিমার ব্যবহার কমে এসেছে।

বাংলা সাহিত্য জগতের অন্যতম লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী, তাঁর লেখার ভাষায় মেয়েলি ভঙ্গিমার পরিচয় বিশেষ মেলে না। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন তিনি মেয়েদের সংলাপে। বঙ্কিমচন্দ্র গ্রাম্য মেয়েদের মুখে সম্বোধন স্থানে 'লো' ব্যবহার করেছেন তেমনি স্বর্ণকুমারীদেবীও। স্বর্ণকুমারীদেবীর লেখনীতে 'লো', 'দেখিলো', 'হ্যাঁলো' এই জাতীয় শব্দের ব্যবহার রয়েছে। যেমন—

"সর্বনাশ— লো সর্ব্বনাশ! এতদিন মেয়ে মানুষের মন চেনাই দায় ছিল ..." (লজ্জাশীলা / স্বর্ণকুমারী রচনাবলী / রামায়ণী ৩৪৯/২৫)

স্বর্ণকুমারীদেবীর ভাষায় 'গিরি', 'পনা' উপসর্গের ব্যবহারে 'আদুরে গিরিফলানো' বা 'সোহাগীপনার' মতো মেয়েলি শব্দের ব্যবহার রয়েছে। যেমন—

"যাও, আর অত সোহাগিপনা করতে হবে না ..." (পাকচক্র, স্বর্ণকুমারী রচনাবলী, রামায়ণী ২৭৭/২)

রয়েছে ছাই, কালামুখী, মরণ, ইত্যাদি মেয়েলি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

"বিয়ের কথা কি বলতে এসেছ, তাই বল না ছাই!" (পাকচক্র, স্বর্ণকুমারী রচনাবলী, রামায়ণী ২৭২/১৬)

"সিধু। এমনো কালামুখী।" (লজ্জাশীলা, স্বর্ণকুমারী রচনাবলী, রামায়ণী, ৩৪৭/৬)

"মরণ— তুই ক্ষেপেছিস— আমার কাছে" (লোহার সিন্দুক, স্বর্ণকুমারী রচনাবলী, রামায়ণী, ৩৫৮/১)

সীতাদেবী বা শান্তাদেবীর রচনাতেও মেয়েলি ভাষা ব্যবহারের বিশেষ নজির মেলে না। কারণ সীতাদেবী ও শান্তাদেবী সমকালীন অন্যান্যদের তুলনায় শিক্ষা-দীক্ষায় বেশিই সুযোগ পেয়েছিলেন এর ফলে তাদের লেখায় মেয়েলি ভাষাভঙ্গিমার ততটা প্রকাশ ঘটেনি। তবে গ্রামীণ স্বল্প শিক্ষিত নারীচরিত্রে মেয়েলি প্রবচন ব্যবহার করেছেন। যেমন—

"আসর ঘরে মশাল নেই, ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া' বা 'মা ম'লে বাপ তালুই, ছেলে হবে বনের বাবুই

প্রভৃতি প্রবচন" (অলখঝোরা উপন্যাস)

এছাড়া কিছু মেয়েলি শব্দের ব্যবহার রয়েছে শান্তাদেবীর লেখনীতে। যেমন— ছেঁচকিপোড়া, সতীলক্ষ্মী।

(ক) "দিদি আর কতক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে
ছেঁচকিপোড়া হব?" (চিরন্তনী উপন্যাস)

সীতাদেবীর লেখনীতে মেয়েদের জগতের সবচেয়ে প্রিয়শব্দ 'সোহাগ' শব্দের ব্যবহার রয়েছে। যেমন—

"আমি তাঁর আদর সোহাগ যথেষ্টই পেতাম, কিন্তু
... তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সুখ-দুঃখের সমান অংশ
কোনোদিন পাই নি।" (স্বর্ণশৃঙ্খল)

শান্তাদেবী-সীতাদেবীর নায়িকারা প্রত্যেকেই শিক্ষিত। তাঁদের বাসস্থান শহরে। তাই সুশিক্ষিতা শহরে থাকা মেয়েদের মুখে মেয়েলি ভাষার ব্যবহার দেখা যায় না।

অনুরূপাদেবী বা নিরুপমাদেবীর লেখনীতে মেয়েলি ভাষারীতি লক্ষ্য করা যায়। উভয়েই নারীদের কথাবার্তায় মেয়েলি জগতের খুটিনাটি অনুষঙ্গ, বাকপ্রতিমা, অন্তঃপুরে প্রচলিত শব্দাবলীর ব্যবহার করেছেন। তবে তারা গ্রামের অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত মেয়েদের মুখে এসব ভাষার ব্যবহার করেছেন। যেমন—

(ক) "পুরুষ বেটাছেলে হয়ে তোর ওই একটা
টগরাপুঁটে মেয়ের সঙ্গে লড়তে ভয়?" (অনুরূপাদেবী,
পথহারা উপন্যাস)

অনুরূপাদেবীর লেখনীতে মেয়েলী প্রকাশভঙ্গী ও মেয়েলি প্রবচনের

ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

(ক) *"ও মেয়ের হাড়ে হাড়ে ভেল্কি খেলে, পেটে পেটে ওর বজ্জাতি। ওরই নাম মিটমিটে ডাইনি, ওকেই বলে ছেলে খাবার রাক্ষস।"* (পথহারা, অনুরূপাদেবী)

(খ) *"মেয়েটিকে বুঝি ঝিঙে, শসার মতন বীজ রেখেছ, হাঁগা সহ?"* (মহানিশা উপন্যাস, অনুরূপাদেবী)

নিরুপমাদেবীর লেখনীতে মেয়েলি ভাষা ভঙ্গিমার ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

(ক) *"পাপের ফল তো আছেই, তা মাগী একে ভয় কি? আর একটা বিয়ে করলেই চলবে।"* (প্রায়শ্চিত গল্প)

(খ) *"পেটে হলে কি হয় বড় বৌদিই তো হল আদত মা, ছেলের জন্যই তো ছোট বউদিদিকে আনা— ওতো খোলস বই নয়।"* (প্রত্যাখ্যান গল্প)

মেয়েলি ভঙ্গিমার বিশেষ প্রভাব নেই জ্যোতির্ময়ীদেবীর লেখনীতে। জ্যোতির্ময়ীদেবী জীবনের বৃহৎ অংশ রাজস্থানে অতিবাহিত করায় তাঁর লেখনীতে শুধু বাংলার মেয়েদের নয়, রাজস্থানের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জায়গার মেয়েদের জীবনকাহিনী ও সেসব প্রদেশের প্রচলিত অবাঙালি শব্দাবলী ওঠে আসে। এখানেই জ্যোর্তিময়ীদেবীর শব্দব্যবহারের অভিনবত্ব। 'মুঙফলি' (বাদাম), 'চুননী' (ওড়না) , 'পিণ্ড' (দেশ), 'চোটি' (বিনুনি), 'লহরিয়া' (উখেলানো) প্রভৃতি অবাঙালী

শব্দাবলী বাংলার মেয়েদের মুখের ভাষার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। জ্যোতির্ময়ীদেবীর লেখনীতে বাংলার মেয়েলি শব্দের ব্যবহার একেবারে চিহ্নমুক্ত নয়। যেমন—

> *"দিদির মুখ 'শাক' হয়ে গেছে কিসের ভয়ে' 'তাই বলে সব ছোঁয়া-লেপা জৈ জৈ করবে' কিংবা 'কোথাকার কোন নিমুড়ো নিছুড়ো বাঙাল মেয়ে' "*
> (এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা)

উল্লেখ্য যে, জ্যোতির্ময়ীদেবীর লেখনীতে মেয়েলি প্রবচনের ব্যবহার দেখা যায়।

> (ক) *"কথায় বলে না, 'দেবতা দিলে ফুরোয় না, মানুষের দেওয়ায় কুলোয় না।' যদিও এসব মেয়েলি কথা। তবু এ সমস্ত কথার দাম আছে, দরকারের সময় ভেবে নেবার জন্য, হয়তো বলবার জন্যও।"*
> (বৈশাখের নিরুদ্দেশ যাত্রা)

> (খ) *"বাংলায় একটা কথা আছে, মার মুখে শুনেছি, 'এসো লক্ষ্মী যাও বালাই।"* (বৈশাখের নিরুদ্দেশ যাত্রা)

শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনাতে মেয়েলি ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। 'টেপামুখী', 'ছেঁচকিপোড়া', 'পেটুক্ষুরেপনা', 'র‍্যাঙ্গামী', 'লক্ষ্মীছাড়া', প্রভৃতি মেয়েলি শব্দ শৈলবালা গল্প-উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে। যেমন—

> (ক) *"ওই গতরখোকা ভদরকুটে চালচিবুনী ছোলাভিজুনী ঝগড়াটে টেপামুখ গেরোলক্ষ্মী।"* (জন্ম

অপরাধী উপন্যাস)

শৈলবালা অনেক ক্ষেত্রে তাঁর রচনায় ইংরেজি শব্দ ও মেয়েলি শব্দ একই বাক্যে ব্যবহার করেছেন। যেমন—

> *"যারা দিনরাত পরের সঙ্গে ঝগড়া আর হিংসুটিপনা করে বেড়ায় তার স্বভাবতই* ***weak minded*** *হয়ে পড়তে বাধ্য।"* (সই উপন্যাস)

বাংলা সাহিত্য জগতে সমসাময়িককালে আশাপূর্ণা ও আশালতার আবির্ভাব ঘটলেও তাঁদের ভাষাভঙ্গিমা সম্পূর্ণ পৃথক। আশাপূর্ণাদেবীর রচনাসম্ভার মেয়েলি ভাষা ভঙ্গিমার বিপুলভাণ্ডার রূপে পরিগণিত। বাঙালি মেয়েরা যখন 'অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরচারিণী', তাঁদের শিক্ষার্জনে নিষেধাজ্ঞা, সবকিছুতেই অধিকারহীনতা, প্রায় সেই সময়েই আশাপূর্ণার জন্ম ও লেখালেখির পালা শুরু। তাই আশাপূর্ণার লেখনীতে সহজেই জায়গা করে নেয় সেকালের সমাজ, নারী পরিসর ও অন্তঃপুরচারিণীদের বচনমালা। সমাজ নির্ণীত বিধান মেয়েরা অন্তঃপুরেই থাকবে। সেই অন্তঃপুরচারিণীদের প্রাত্যহিক কথাবার্তা, ঈর্ষাজড়ানো উক্তি-প্রত্যুক্তি, তাঁদের ব্যবহৃত শব্দাবলী, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া যা 'মেয়েলি ভাষা' বলে চিহ্নিত, আশাপূর্ণার লেখনিতে সেই 'মেয়েলি ভাষার' স্ফুরণ চোখে পড়ে।

অন্যদিকে আশাপূর্ণার সমসাময়িক লেখিকা আশালতার লেখনী পুরোভাবেই 'মেয়েলি ভাষা' ব্যবহার থেকে চিহ্নমুক্ত। আশালতার গল্প-উপন্যাসের নারীচরিত্ররা সুশিক্ষিত, জীবনসম্পর্কে সচেতন, স্বাবলম্বী, শহর তাদের বাসভূমি, তাদের মুখে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সাহিত্যিকদের উদ্ধৃতি ও অনুষঙ্গ। আশালতা শহরে থাকা সুশিক্ষিত, আধুনিক চিন্তাধারার অন্তর্ভুক্ত মেয়েদের মুখের ভাষায় মেয়েলি ভাষা প্রয়োগ করেননি, এমনকি, গ্রামাঞ্চলে থাকা নারী চরিত্ররাও মেয়েলি ভাষাভঙ্গিমা থেকে অনেকটাই প্রভাবমুক্ত।

আশাপূর্ণা ও আশালতার ভাষাভঙ্গিমা পৃথক হয়ে ওঠার পেছনে রয়েছে উভয়ের পারিবারিক পরিবেশ। আশাপূর্ণার জীবন আলেখ্যে অভিনিবেশ করলে জানা যায় আশাপূর্ণা শৈশব থেকেই রক্ষণশীল পারিবারিক বাতাবরণে বড় হয়ে উঠেন। লেখাপড়া শেখার চরম ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পাননি তিনি। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ধারণা ছিল মেয়েদের লেখাপড়া শিখতে নেই। মেয়েরা লেখাপড়া করলে বিধবা হবে, নৈতিক স্খলন ঘটবে। তাই সময়োচিত নীতি মেনেই আশাপূর্ণাকে লেখাপড়া শিখতে স্কুলে পাঠানো হয়নি। লেখাপড়া প্রসঙ্গে আশাপূর্ণাকে বলতে শোনা যায় ভাইরা যখন বই পড়তেন তখন উল্টো দিক থেকে বসে আশাপূর্ণা তাঁদের পড়া দেখতেন। ফলে তিনি উল্টো অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত হন। পিতৃতন্ত্রের অশেষ নিয়মনীতির বেড়াজালে বন্দী সেকালের মেয়েদের যেমন ভূগোল, ইতিহাস মুখস্থ করা বা অংক কষার বালাই নেই কারণ তাদের পরিবারের সদস্যদের বিশেষ করে ঠাকুমাদের ধারণা ছিল মেয়েরা স্কুলে গেলে বাচাল বা অভদ্র হবে।

> *"মেয়েদের ভূগোলের সীমানা মানেই তো চারদেওয়ালে বন্দি খাঁচার মানচিত্র, আর ইতিহাসে সে তো নির্যাতনের পরম্পরা; অঙ্ক কষার তো কোনও প্রয়োজন নেই কারণ তাকে তো ব্যস্ত থাকতে হবে ভাঁড়ার ঘরের হিসেব নিকেশ করে, সেখানে বীজগণিতের সমীকরণ কী কাজে আসবে।"*[৪]

আশালতাকে অবশ্য এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। আশালতা প্রগতিশীল ও আধুনিকমনস্ক পারিবারিক বাতাবরণে বেড়ে ওঠেন। পিতা যতীন্দ্রমোহন তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নানা বিধি-নিষেধকে উপেক্ষা করে মেয়েকে গড়ে তুললেন নিজের মতো করে। আশালতা স্কুলে বিদ্যার্জনের সুযোগ পান। এমনকি, পিতা যতীন্দ্রমোহন 'ভাগলপুর ইনস্টিটিউট' নামে ক্লাবের

পুরোনো লাইব্রেরি ও ক্লাবের একটি কক্ষে থাকা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার থেকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সাহিত্যিকের গ্রন্থ এনে দিয়ে আশালতার গ্রন্থক্ষুধা মেটাতেন। আশালতা খুব অল্প বয়সেই সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনের মতো এমন বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, পিতার সাহচর্যে ও সাহায্যেই আশালতার শিল্পীসত্তা অবাধে বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। সেকালের রক্ষণশীল সমাজে থেকেও আশাপূর্ণার মতো আশালতাকে রক্ষণশীল পারিবারিক বাতাবরণে বড় হতে হয়নি। কারণ আশালতার পরিবার ছিল প্রগতিশীল ও আধুনিক চিন্তাধারার অধিকারী। আশাপূর্ণা রক্ষণশীল পারিবারিক বাতাবরণে বেড়ে ওঠায় সেই চিরচেনা পরিবার জীবনে মেয়েদের অবস্থান, মেয়েলি জগতের খুঁটিনাটি অনুষঙ্গ তাঁর লেখনীর বিষয়বস্তুরূপে ওঠে আসে এবং মেয়েদের ভাষাভঙ্গিমা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখার ভাষা হয়ে পড়ে। মেয়েলি ভাষা ব্যবহারের বিশেষ নজির মেলে আশাপূর্ণার গল্প-উপন্যাসে। আশাপূর্ণা মেয়েমহলের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শৈশব থেকেই ওয়াকিবহাল ছিলেন বলে তাঁর লেখনীতে খুঁজে পাই সেকালের মেয়েদের কথার ধরন যেমন— প্রিতিকার, সম্পক্ক, নেমতন্ন, প্রাচিত্তির, প্রিকিতি, প্রিতিজ্ঞে, গেরাম, সক্কালবেলা, অধোয্যে, অন্যাই, উদ্দিশ, সন্দবাতিক, পেনসিন, রাজিশুদ্ধ, অবিশ্যি, ক্ষ্যমতা, আশ্চয্যি, প্রেত্যক্ষ, ভদ্দরলোক, পেন্নাম, প্রিতিমা, ছেরাদ্দর পিণ্ডি, প্রেমপাত্তর, উপগারে, তুশ্চ, অপমান্যি, ধম্মকথা, ব্যাভার প্রভৃতি।

(১) *"কোন ওখান থেকে নেমতন্ন এলে সেখানে কী লৌকিকতা পাঠাতে হবে, এ সমস্ত মা করতেন, তবে জেঠিমার ঘরে ঢুকে ঢুকে জিজ্ঞেস করে করে করতে দেখেছি।"* (ঝিনুকে সেই তারা, আশাপূর্ণাদেবী, পৃঃ ২০৭)

(২) *"ঘরে থাকলে যে ছুটির দিন গেরস্থর একটা*

উপগারে লাগতে হতে পারে।" (কি তুচ্ছের বিনিময়ে, গল্প, আশাপূর্ণাদেবী, পৃঃ ৪৮০)

(৩) *"বাজারে যাচ্ছে দোকানে যাচ্ছে— এমন কি পেনসিন নিতে যাচ্ছে, তাও ওটাকে ঘাড়ে করে।"* (ফয়সালা গল্প, আশাপূর্ণাদেবী, পৃঃ ৪৭৭)

(৪) *".... বলে কিনা গেরাম সুদ্ধ লোককে ধরে ধরে রুগী বানিয়ে পসার বাড়াবার তাল।"* (সাধনবদ্যির গপ্‌পো- গল্প, পৃঃ ৪৯৬)

(৫) *"ভেতর থেকে একটা নারীকণ্ঠের বিরক্তি তিক্ত আওয়াজ শোনা গেল— সক্কালবেলা কোন ডাকাত জ্বালাতে এল, অ্যাঁ।"* (ফয়সালা গল্প, আশাপূর্ণাদেবী, পৃঃ ২০৪)

(৬) *"ওরা আমার ঘরে ঢুকে ঢুকেও পেন্নাম করে যায়।"* (ঝিনুকে সেই তারা, আশাপূর্ণাদেবী, পৃঃ ২০৪)

(৭) *"যেমন মহাপাতক করেছ তুমি, তার মহা প্রাচিত্তিরই করেছ। তুষানলে জ্বলে জ্বলে খাক হয়েছ।"* (প্রথম প্রতিশ্রুতি, আশাপূর্ণাদেবী, পৃঃ ২৯৯)

(৮) *"ছোটলোক কথাটা কারুর গায়ে লেখা থাকে না, ব্যাভারেই ছোটলোক ভদ্দরলোক!"* (সুবর্ণলতা, আশাপূর্ণাদেবী, পৃঃ ১৩৭)

(৯) *"তুমি কিনা তোমার প্রেমপাত্তরের প্রিয়ার রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে পড়ে বসলে?"* (বকুলকথা, আশাপূর্ণাদেবী, পৃঃ ৭৩)

(১০) *"ওঁরা আবার ধম্মকথা কইতে আসেন। মানুষ কেষ্টর জীব! অতিথি! নারায়ণ! যত ফক্কিকারি কথা।"* (সুবর্ণলতা, আশাপূর্ণাদেবী, পৃঃ ২০৬)

মেয়েদের ভাষায় গালিগালাজ জাতীয় শব্দ শোনা যায়। যা পুরুষের মুখে ততটা শোনা যায়। অন্তঃপুরচারিণীদের ব্যবহৃত গালাগাল জাতীয় শব্দ যা মেয়েলিভাষার অন্তর্ভুক্ত, আশাপূর্ণা তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেছেন। যেমন— কালামুখী, পোড়ামুখ, লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়ী, হারামজাদী, সৃষ্টিছাড়া, বাপসোহাগী, বজ্জাত, জাঁহাবাজমাগী, মুখপোনা, টেপামুখী, দুষ্টুপাজী, পোড়ারমুখী, আস্পদ্দাবাজ, সর্বখাকী, অভাগী, পোড়াকপালী, ইতর প্রভৃতি।

(১) *"আর তার কিছুদিন পরেই হারামজাদী বেটার বৌটা একটা বজ্জাতের সঙ্গে ভেগে গেল।"* (ফয়সালা গল্প, পৃঃ ৪৭৭)

(২) *"দত্তগিন্নী বলনে, 'পোড়ারমুখী মোক্ষদা তো তা হলে ঠিকই বলেছে।"* (প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃঃ ২৮২)

(৩) *"নইলে একবার দেখে নিতাম সে বা কত বড় ঘুঘু আর ওই বাপসোহাগী বেটিই বা কত বড় হারামজাদী!"* (প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃঃ ১৭৮)

(৪) *"বেয়াড়া আস্পদ্দাবাজ বৌটাকে যতই*

গালমন্দ করুণ, তার জন্যে উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন বৈকি মুক্তকেশী" (সুবর্ণলতা, পৃঃ ৩৪)

(৫) *"মুক্তকেশী আক্ষেপ করে বলনে, 'মনে করেছিলাম পোড়াকপালী সর্বখাকী এসে তবু আমার একটু সুসার হলো, আমার হাত-নুড়কুৎ হবে, আমাকে এক ঘটি জল দেবে! তা নয়,"* (সুবর্ণলতা, পৃঃ ২১৪)

(৬) *"সৃষ্টিছাড়া ওই মেয়েটাকে তাই যখন-তখন তার বাপের সামনে হাজির করেন ভূতো ন ভবিষ্যতি করতেই হয় মোক্ষদাকো"* (প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃঃ ৫৪)

(৭) *"আ মরণ মুখপোড়া মেয়ে! ওরা ছিপ্ ফেলে মাছ ধরে? ওরা তো গামছা ছাঁকা দিয়ে চুনোঁপুটি তোলে!"* (প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃঃ ১৩)

(৮) *"কাল রাত দুপুর অবধি সবাইয়ের সঙ্গে কুটনো কুটছে লক্ষ্মীছাড়া—"* (প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃঃ ৯৩)

(৯) *"এ তো আচ্ছা জাঁহারবাজমাগী!" দত্ত গিন্নী তেড়ে খাট থেকে উঠে দুম দুম করে মাটিতে নেমে আসেন, বলেন, "তোমার রীতি-নীতি তো ভালো দেখছি না!"* (প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃঃ ৩১১)

(১০) *"তবে একটু ময়লা কি ছেঁড়া পড়লেই*

দত্তগিন্নী "গ্যাদারী বেজারমুখী মেজবৌটাকে শুনিয়ে শুনিয়ে শৈলকে বলেন, "হ্যাঁলা, কাপড় এত ময়লা কেন? নেই বুঝি?" (প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃঃ ২৯০)

এছাড়া আশাপূর্ণার লেখনীতে প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফসল হল 'প্রবাদ'। আর 'বাগধারা' হল এমন একটি বাক্য যা বিশিষ্ট অর্থ প্রদান করে। মেয়েদেরকেই এসমস্ত প্রবাদ প্রবচন ও বাগধারার প্রয়োগ বেশী করতে দেখা যায়।

বাগধারা—

যেমন—

(১) পায়াভারী (অহংকারী, দাম্ভিক)

"কিরে সত্য, মুখে কথা নেই যে, বাবা, আজ এত পায়াভারী কেন রে তোর?" (প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃঃ ৩৮)

(২) শাপের বর (মন্দ হতে ভালোর উৎপত্তি)

"শৈলজারও কি এত আক্ষেপ এল তাঁর মেজ ছেলেটার মতো? বরং হয়তো মনে-মনে ভাবলেন, শাপের বর।" (বিরোধীপক্ষ গল্প, পৃঃ ৫২৩)

(৩) ডুমুরের ফুল— (অসম্ভব ব্যাপার)

"এই যে ডুমুরের ফুল, ঠাকুরঝি।" এই বলে সুকুমারী তাড়াতাড়ি ননদের পা ধোবার জল আনতে ছোটে।" (প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃঃ ১১২)

(৪) সমুদ্রে বালির বাঁধ— (দুর্বল প্রতিরোধ ব্যবস্থা)

"কিন্তু একা কতটুকু কি করতে পারে জ্যোতু নামের সরল ছেলেটা? তার চেষ্টা হচ্ছে সমুদ্রে বালির বাঁধা! ধস নামেই।" (বিরোধী গল্প, পৃঃ ৫২৮)

(৫) সাপের পাঁচ পা— (বাড়াবাড়ি করা)

"ছিপ ফেলে মাছ ধরবি তুই? খুব নয় বাপ সোহাগি আছিস, তাই বলে কি সাপের পাঁচ পা দেখেছিস?" (প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃঃ ১২)

প্রবাদ—

(১) বামুনের ঘরে কুষ্মাণ্ড

"চোপ্‌রাও!" হঠাৎ যেন ঘুমন্ত বাঘ জেগে ওঠে গর্জে উঠল, "চোপরাও বামুনের ঘরে কুষ্মাণ্ড" (প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃঃ ৩৩)

(২) ঘর শত্তুর বিভীষণ

"তাই যে তাজ্জব করলি নাপিত-বৌ, এই কদিন তোকে তুক করল না গুণ করল লো! তাই ঘর শত্তুর বিভীষণ হলি!" (প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃঃ ১২০)

(৩) জুতো মেরে গরুদান

"মায়ের নামে মামলা ঠুকে রেখেছেন আবার ঢং করে আসেন, চুন্মামেত্তর খেতে! জুতো মেরে গরু দান!" (সুবর্ণলতা, পৃঃ ৯৫)

(৪) অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়।

"কই আর হল, অভাগ্যির কপাল। বলে, 'অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকিয়ে যায়।" (দু'ঘরা ফ্ল্যাট গল্প, পৃঃ ৫৪৭)

(৫) ভাত ছড়ালে কাকের অভাব

"মুক্তকেশী ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, বলেন, 'বেরিয়ে যা! বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে! ভাত ছড়ালে কাকের অভাব?" (সুবর্ণলতা, পৃঃ ১০৪)

(৬) তিলকে তাল করা—

"সুবর্ণ ফের শাশুড়ীর মুখের উপর বলে বসে 'আপনারা বড্ড তিলকে তাল করেন, তুচ্ছ কথা নিয়ে এত হৈ-চৈ করতে ভাল লাগে।" (সুবর্ণনতা, পৃঃ ১৭)

(৭) আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরের দরকার কি?

"মেয়েমানুষের এত জানা, এত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর রাখা হচ্ছে অনর্থের মূল। ও থেকেই সন্তোষ নষ্ট, শান্তি নষ্ট, বাধ্যতা নষ্ট। আদার ব্যাপারী জাহাদের খবরের দরকার কি বাপু?" (সুবর্ণলতা, পৃঃ ২৩৮)

(৮) বার্ধক্যে বারাণসী

"লঙ্ঘন করার চিন্তার ধারে কাছে কারো ছায়া দেখলেই যে মুক্তকেশী বলে বসেন, 'থাকবো না,

চলে যাবো! 'বার্ধক্যে বারাণসী' একথা ভুলে বসে আছি বলেই এত হেনাস্থা আমার!" (সুবর্ণলতা, পৃঃ ৬৮)

(৯) অভাবে স্বভাব নষ্ট

"অভাবে স্বভাব নষ্ট চিরকেলে কথা— সুবর্ণ বলে, 'যার নিজের তিন কুলে করবার কেউ না থাকে, পরের দরজায় হাত পাতবে এটাই স্বাভাবিক!" (সুবর্ণলতা, পৃঃ ২২৪)

(১০) রাজায় রাজায় দেখা হয় তো বোনে বোনে দেখা হয় না।

"রাজায় রাজায় দেখা হয় তো বোনে বোনে দেখা হয়না। এই তো পারুলের সঙ্গে কি হলো দেখা? সে তো সেই কোন্ বিদেশে।" (সুবর্ণলতা, পৃঃ ৩৪৩)

মেয়েদের বাক্যের সঙ্গে অর্থগতদিক থেকে সম্পর্কহীন এমন কিছু শব্দ বা শব্দাংশ ব্যবহার করতে দেখা যায় যা তৎকালীন মেয়েদের ভাষার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আশাপূর্ণার লেখনীতে এসব শব্দ বা শব্দাংশ ছড়িয়ে আছে। যেমন— 'অ্যাই', 'গো', 'ওগো', 'লো', 'হ্যাঁগো', 'ভাই', 'ওলো', ইত্যাদি শব্দ।

(১) *"হ্যাঁগো, রেলিঙে সবুজ রঙ দেওয়া থাকবে তো?"* (সুবর্ণলতা, পৃঃ ৮)

(২) *"মিথ্যে বলব না ভাই, ওই ভয়ে তোমাদের ভাইকে আমি সাধ্যপক্ষে এ বাড়িতে একা আসতে দিই নে।"* (প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃঃ ৩৬৬)

(৩) *"হ্যাঁ। হ্যাঁ। নিতেই হবে। এরপর তো তোমরা*

আমার টাকা পা দিয়েও ছোঁবে না ভাই! তখন আমি কি করবো?" (বিরোধীপক্ষ গল্প, পৃঃ ৫৩৩)

(৪) *"তোমার সব কী গো! দুধের বাছা একটা, আর ভেতরের ঘটনাও জেনেছ সবাই, ওর প্রাণটার দিকে তাকাচ্ছে না?"* (সুবর্ণলতা, পৃঃ ১২)

(৫) *"ওলো থাম্ থাম্ তুই আর কথার কায়দা শেখালে আসিস নি!"* (সুবর্ণলতা, পৃঃ ১০৪)

(৬) *"বাড়ি আমার একলার নয়। মাথার ওপর মা দাদা এদিকে ভাইয়েরা, আমি আবদার করিগে— ওগো আমার বৌ গড়ের মাঠের ওপর বাড়ি চায়। যতসব!"* (সুবর্ণলতা, পৃঃ ৫)

(৭) *"হ্যাঁগো কতখানি চওড়া হচ্ছে?"* (সুবর্ণলতা, পৃঃ ৭)

(৮) *"হ্যাঁলা, তা মাথায় বিষবাণ বিঁধে রেখে দিলি, উদ্ধার কর্। মেয়ে কি বলল তাই বল",* (প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃঃ ১২১)

এছাড়া সেকালের মেয়েদের মুখে ব্যবহৃত ছড়া, অসমাপ্ত বাক্যের ব্যবহার দেখা যায় যা মেয়েলি ভাষার অন্তর্ভুক্ত। আশাপূর্ণার লেখনীতেও এসব কিছু সহজেই আমাদের নজরে আসে।

ছড়া—

(১) *"জটাদাদা পা গোদা*
যেন ভোঁদা হাতী,

বৌ-ঠেঙানো, দাদার পিঠে
ব্যাঙে মারে লাথি।
জটা জটা পেট মোটা—
ভাত খারবার ধাড়ী,
দেখব মজা কেমন সাজা
যাও না শ্বশুরবাড়ি।"
(প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃঃ ২৮)

(২) *"মেয়ে বিয়োলাম, জামাইকে দিলাম,*
বেটা বিয়োলাম বৌকে দিলাম,
আপনি হলাম বাঁদী,
ইচ্ছে হয় যে, দুয়োরে বসে
ঠ্যাং ছড়িয়ে কাঁদি!
(সুবর্ণলতা, পৃঃ ১৯)

(৩) *"যার সঙ্গে ঘর করি নি*
সে-ই বড় ঘরণী,
যার হাতে খাইনি,
সে-ই বড় রাঁধুনী।"
(সুবর্ণলতা, পৃঃ ৪৮)

(৪) *"কলকেত্তাই বাবু*
এক ছটাকে কাবু!
কোঁচার ঝুল লম্বমান,
উদর ফাঁকা মুখে পান।"
(সুবর্ণলতা, পৃঃ ১৪৯)

(৫) *"চড়েনবাবু জুড়ি গাড়ি,*
চেনেন খালি শুঁড়ির বাড়ি!"
(সুবর্ণলতা, পৃঃ ১৫০)

অসমাপ্ত বাক্যের প্রয়োগ—

(১) *"মা চলে গেলে আর চিলকোঠায় কেন? বিরাজ অবাক হয়, 'দোতলার ঘরেই তো—"* (সুবর্ণলতা, পৃঃ ২৭)

(২) *"মায়া মমতা কী আপনার প্রাণে একেবারে দেননি ভগবান? মরে যাচ্ছে মানুষটা, তবু বাক্য যন্ত্রণা—"* (সুবর্ণলতা, পৃঃ ৩৪)

(৩) *"সুবর্ণ সেই বলার পিছনে সমস্ত চিত্তকে উন্মুখ করে রেখেছিল, সুবর্ণ সমুদ্রের স্বপ্ন দেখেছিল। তাই সেদিন কেদার—"* (সুবর্ণলতা, পৃঃ ৫৩)

(৪) *"এরপরও আর তোমরা আমায় এ সংসারে থাকতে বল বাবা? না হয় তোমাদের শাঁখা-চুড়ি পরা মা নয়, তবু মা তো—"* (সুবর্ণলতা, পৃঃ ৩৯)

(৫) *"ভুবনেশ্বরী ঘোমটার মধ্যে থেকেই রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "তা কি করবো! চোরে কামারে তো দেখা নেই, একটা কথার দরকার থাকলে—"* (প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃঃ ২০৬)

(৬) *"আপনার কপিটার জন্যে কাগজ আটকে রয়েছে অনামিকা দেবী। সামনের সপ্তাহে বেরোবার*

কথা অথচ—" (বকুলকথা, পৃঃ ১৮)

(৭) *"বড়দা তোমার থেকে কী এমন বড় শুনি যে এতো ভয়! বাবা তো কিছু বলেন না। মা তো — তোমাকে কতো—"* (বকুলকথা, পৃঃ ৩৮)

সেকালের মেয়েরা কারো সম্পর্কে বলতে গেলে সোজাসুজি তার নাম না ধরে আত্মীয়বাচক শব্দের ব্যবহার করত। আশাপূর্ণার লেখনীতে সেই আত্মীয়বাচক শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

(১) *"ঠাট্টা করে বলেছিলাম, ছোট ঠাকুরঝি লাগিয়ে দিতে গেল কেন?"* (সুবর্ণলতা, পৃঃ ১৭)

(২) *"মহেষসাহেই গল্প হচ্ছিল ননদ— ভাজে"* (সুবর্ণলতা, পৃঃ ১৬)

(৩) *"বেয়াই আমার খুব দৈ-দস্তর করল"* (সুবর্ণলতা, পৃঃ ৩৬)

(৪) *"বোনপো-বৌ ভাগ্নে-বৌ তা-ও অনেক দেখেছেন"* (সুবর্ণলতা, পৃঃ ১৭)

(৫) *"বয়সে তিন বছরের ননদকেও এই তোয়াজটুকু করে নেয় সুবর্ণ"* (সুবর্ণলতা, পৃঃ ১৬)

(৬) *"ভাসুর-দেওরদের নাম নিয়ে তামাশা করেছে সুবর্ণ"* (সুবর্ণলতা, পৃঃ ১৬)

(৭) *"ভাইপো-বৌয়ের হাস্যরঞ্জিত মুখটা মুহূর্তে যেন কাঠ হয়ে যায় গম্ভীর মুখে বলেন, 'রুচিও*

নেই।" (বকুলকথা, পৃঃ ১২১)

সেকালে মেয়েদের ভাষায় 'মরণ', 'মরা', 'অসভ্য', 'পাজি', 'ধ্যা', 'পাগলা', 'মিষ্টি', 'যাঃ এমন ধরনের কিছু শদের ব্যবহার রয়েছে। আশাপূর্ণার লেখনীতে এমন শব্দের ব্যবহার হতে দেখা যায়। যেমন—

(ক) *"আ মরণ মুখপোড়া মেয়ে! ওরা ছিপ ফেলে মাছ ধরে? ওরা তো গামছা ছাঁকা দিয়ে চুনোপুঁটি তোলে।"* (প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃঃ ১৩)

(খ) *"পাগল! পুরীর রেল তখন কোথায়?"* (সুবর্ণলতা, পৃঃ ৫৪)

(গ) *"নাঃ, একেবারে বদ্ধ পাগল! ও মেজকর্তা, ওহে ও মেজকর্তা, গিন্নীর মর্মবার্তাটা শুনে যাও একবার হে—"* (সুবর্ণলতা, পৃঃ ৫৫)

(ঘ) *"ধমকে উঠলেন রামকালী। বিরক্ত হলেন। কী অসভ্য হচ্ছে মেয়েটা!* (প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃঃ ১৬)

অথচ আশাপূর্ণার সমসাময়িক লেখিকা আশালতার কলমে মেয়েলি ভাষাভঙ্গিমা কিন্তু চিহ্নমুক্ত। অভিজাত পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠায় আশালতার চির চেনা পরিবেশে কখনও মেয়েদের মুখে এমন ধরনের কথা শুনতে হয়নি। প্রগতিশীল ও আধুনিকমনস্ক পারিবারিক বাতাবরণে বেড়ে ওঠায় শৈশব থেকেই আশালতা তৎকালীন সময় থেকে প্রাগ্রসর ছিলেন। পিতার সাহচর্যে ও সাহায্যে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পান। এমনকি, অত্যন্ত অল্প বয়সেই ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যে লক্ষণীয় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। সেকালের মেয়েলি জগত তাঁর কাছে

অনেকটাই ছিল অপরিচিত তাই তাদের জীবনচর্যা, ভাষা, আশাপূর্ণার মতো তাঁর লেখনিতে উঠে আসেনি। বড়ো জোর গ্রামের রান্নাঘরে মেয়েদের মজলিসে শোনা যায় এরকম ভাষা—

"বলি তোরা কালে কালে কি হলি লো! রবিবার দোয়াদশীর দিন মুশুরি!" (পরিবর্তন উপন্যাস)

এখানে দ্বাদশী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ছাড়া মেয়েলি ভাব তেমন শোনা যায় না। ভাষার মাধ্যমে প্রত্যেক সাহিত্যিকই নিজস্ব স্টাইলে তাঁর ভাব প্রকাশ করেন। এর ফলে আমাদের সামনে প্রকাশ পায় একজন সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব, জীবনবোধ, কল্পনা এমন অনেক কিছুই। আশাপূর্ণার ভাষার স্টাইল, তাঁর স্বাতন্ত্র্য তাঁকে অন্যান্যদের থেকে পৃথক করে রেখেছে তেমনি আশালতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আশালতার ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল। তবে রবীন্দ্রনাথের মতো 'কাব্যগুণ সমন্বিত' ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে। যেমন—

(ক) 'সুখবাদ' গল্পে দীপ্তির সৌন্দর্য বর্ণনায়—

"শেলী কিংবা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়বার পর সূর্যাস্তের আভার মতো একটি নিটোল, পরিপূর্ণ, সোনালী প্রশান্তি যেমন মনের মধ্যে ধীরে ধীরে ব্যপ্ত হয়ে উঠতে থাকে দীপ্তির সৌন্দর্যও ঠিক তেমনি।" (পৃঃ ৩৬৭)

(খ) 'পরিবর্ত্তন' গল্পে—

"সেদিন শ্রাবণের শেষে সমস্ত আকাশপুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে স্নিগ্ধ হইয়া

উঠিয়াছে।" (পৃঃ ২৫৫)

(গ) 'প্রেমেপড়া' গল্পে—

"সোনালী আলোয়, সূর্যাস্তের আভায়, নিজের মনকে একাকী এলিয়ে দিয়ে একটু একটু করে চা'য়ের স্বাদ নেয়।" (পৃঃ ২১১)

(ঘ) বেদনার বিভিন্নতায় 'প্রকৃতি'র রূপ বর্ণনায়—

"বাহিরে শ্রাবণের আকাশ স্নিগ্ধ দিগ্‌বলয় রেখা যেখানে শ্যাম-বনরেখার সহিত মিলিয়াছে। সেখানেও ঘন নীল মেঘের ঘনিমা। থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ চমকাইতেছে।" (পৃঃ ৯৪)

আশালতার সৃষ্ট চরিত্রের মুখের ভাষা হল দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত সহজ, সরল সাধাসিধে আড়ম্বরহীন ভাষা। আশালতার ভাষায় আপন 'চিন্তাধারা' ও 'অনুভূতি' ছাপ স্পষ্ট। পুরুষ ও নারীর ভাষা বা গ্রাম ও শহরের ভাষা আশালতা এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, তাতে কোথাও কোনো বেমানান মনে হয় নি। বাল্যকাল থেকেই আশালতা পিতামহ ও পিতার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা সম্পর্কে পরিচিত হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে এই অভিজ্ঞতাই তাঁর লেখনীতে কাজে লাগে। যেমন—

"ইয়াকে আমি রক্ত পড়ায়ে তবে ছাড়ব দেখি কোন শালা ইয়াকে বাঁচায়, বাবার নাম ভুলাই দিব।"
(ক্রন্দসী, পৃঃ ৫৪)

এই ভাষায় দেখা যায় বীরভূমের আঞ্চলিক রীতি। অথবা—

(ক) *"... তো যাই বলো ছোট ঘোষ, ঐ ওদের*

দল খাওয়ালে বটে পায়েস পরমান্ন রসগোল্লা ....” (নবযুগ, পৃঃ ১০৮)

(খ) *“কেন ওদের দলই বা মন্দ কি, পোলাউ করেনি বটে, কিন্তু ষোলখানা লুচি আর চার জোড়া মণ্ডা সেই বা সোজা কথা হল কোন্‌খেনটায়। পোলাউ কিছু চাদরে বেঁধে ঘরকে আনতে পারলি নে। আর আমার এই দেখ ...”* (নবযুগ, পৃঃ ১০৯)

‘শহরের ভাষা’ বর্ণনাতেও আশালতার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

‘স্পেশালাইজেশন’ গল্পে সুরেশকে বলতে শোনা যায়—

“যাইতে দাও ও সকল ইম্‌মর‍্যাল কথা, ফ্রীলভ আবার কি! সংসারে সর্ব্বত্রই যদি অবাধে ফ্রী লাভের চর্চা চলে তবে দুর্বলদের গতি কি হইবে।” (পৃঃ ১৫৩)

‘স্পেশালাইজেশন’ গল্পটিতে সুকুমারের সংলাপ হলো—

“নরেন বিভিন্ন উপাদান না হইলে সৃষ্টি হয় না; পজিটিভ এবং নেগেটিভ বিদ্যুৎকণার মিলন না হইলে বিদ্যুৎ সঞ্চারময়ী প্রেমের জন্ম হয় না।” (পৃঃ ১৫৪)

ঐ একই গল্পে নরেনের কথা ছিল—

“পাঁচ বছর পরে আমি যখন এরোপ্লেনের চালক হইব তখন ... তখন ***Its a question of only***

ten seconds !" (পৃঃ ১৫৪)

'আশঙ্কা' গল্পে দেখা যায়—

*"সুচরিতা একটু হেসে বলল, "মা কি আজ সারাদিন বসে খাবার করচেন, আমি দেখে আসি।" সে নীচে নেমে গেল। সুনীল একটু ভেবে বলল, "সুচি বোধ হয় রাগ করেচে।" অমলকে বলতে শোনা যায়, "**most unscientific** রাগ। কেবল মেয়েদের পক্ষেই এ সম্ভব।"* (পৃঃ ৩১১)

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল গল্পে—

*'নীরেনের বাংলাতে শানালো না, সে ইংরেজীতে বললে, **that accursed Victoria Memorial"** অর্দ্ধেকটা বলেই থামতে হ'ল। কারণ এ্যলগিন রোডে নীরেনের বাড়ীর সুমুখে এসে ট্যুসীটারটা দাঁড়িয়েছে। ষ্টার্ট থাকানো হয়নি বলে সগর্জ্জনে দাঁড়িয়েছে।"* (পৃঃ ১৫২)

'প্রেমে পড়া' গল্পে দেখা যায়—

*"নিরুপমা যদি বল্‌ত 'আচ্ছা, ভাই অলকা, ব্যবসার বাজার এত মন্দা হো'লো কেন? জগৎ জুড়ে এত বড় **economic drpression** এর কারণটা কি দুর্বোধ্য!"*

তা হলে অলকা, হ্যাঁ তাহলে মন খুলে বেশ আরাম করে কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে কথা ক'য়ে বাঁচত। কিন্তু

তখন আর আফশোষ করবার সময় নেই, নিরুপমা ততক্ষণে হু হু শব্দে বলে চলেছে—

*"জানইত ভাই আমাদের মনের বিচিত্র ব্যবহার। কী থেকে তার যে কী মনে পড়ে যায়— ঠাহর করতে পারিনে। মনে পড়ে সেদিন সন্ধ্যেয় কী একটা কথা জিজ্ঞেস করতে তুমি আমায় 'নিরু' বলে ডাকলে— কী রকম সে চমকে উঠলুম, বলতে পারিনে। সে আমায় ওই নামে ডাকত কিনা। আর কাল যে রবীন্দ্রনাথের গানটা গাইছিলে, 'আমার পরাণ যারে চায়, তুমি তাই তুমি তাই গো।' **It is really heart breaking!** তুমি গানে যে কী রকম প্রাণ ঢেলে দাও।"* (পৃঃ ২১২)

একইভাবে আশালতার নির্মিত নারী ও পুরুষ চরিত্রের ভাষাতেও তাঁর নিপুণ হস্তের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

পুরুষের ভাষা—

(ক) 'মেয়েমানুষ' গল্পে ললিতার শ্বশুড়ের উক্তি—

"চুপ কর। মেয়ে মানুষ হয়েছ, দশ হাত কাপড়েও কোঁচা নেই, সব বিষয়ে বুদ্ধি খাটাতে যেও না।"
"তুমি মেয়ে মানুষ, মেয়েমানুষের মত থাকা তোমায় এসব কথায় থাকবার দরকার কি? আর বোঝাই বা তুমি কি?" (মেয়েমানুষ, পৃঃ ৩৩৮)

(খ) 'মেয়েমানুষ' গল্পে ললিতার নন্দাই এর কণ্ঠে শোনা যায়—

"কে বলেছিল সর্দারি ক'রে তোমাকে কাপড়

আনাতো জান আমি পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি ছাড়া পরিনে, এই চুয়াল্লিশ ইঞ্চির ঠোঁটি কাপড় নিয়ে আমি করব কি? মেয়েমানুষ আছ, মেয়েমানুষের মত থাকলেই তো পার, মোড়লি করতে আস কেন।" (মেয়েমানুষ, পৃঃ ৩৩৯)

(গ) *"কূলবধূর এসব বই পড়া চলে না। একথাটা আমার মনে রেখ। কখন ভুলো না যেন, বিপদ হবে তাহলে।"* (পৃঃ ৪২৩)

(ঘ) 'তৃষ্ণা' গল্পে ঐলোক্যনাথের উক্তি—

"ও-ঘরে কোথায় যাওয়া হয়েছিল শুনি? কোন্‌কুলের বৌ তুমি— যার তার সামনে বার হ'লেই হ'ল? আমি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। সাবধান, বেশি বাড়াবাড়ি ক'রলে মজাটা টের পাইয়ে ছাড়ব।" (পৃঃ ২০৪)

(ঙ) 'রান্নাঘর' গল্পে রমেশের স্ত্রীকে উপলক্ষ্য করে পুরুষজনোচিত উক্তিটি হলো—

"রমেশ সামনের বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হাতের খবরের কাগজখানা খুলিয়া পড়িতে পড়িতে অপ্রসন্ন কণ্ঠে কহিল, এখনও দেরী! এগারোটা বাজে, সকাল থেকে করো কি?" (পৃঃ ৩৪৫)

বা রমেশকে উষ্ণস্বরে বলতে শোনা যায়,

"তাতে তোমার কি? কাগজের ভাবনা রেখে এখন

হাত চালিয়ে রান্নাটা সেরে নাও দেখি। বেলা কত হলো সে খেয়াল আছে? রবিবার, ভাগ্যে কোর্ট বন্ধ, তাই রক্ষা।" (পৃঃ ৩৪৬)

বা রমেশকে একইভাবে আবার বলতে শোনা যায়—

"মেয়েমানুষের পুরুষ সাজতে গেলে এমনই হয়। নিজের যা কর্তব্য। ঘর-সংসার দেখা, রাঁধাবাড়া এই সবই ভালো করে কর, তা নয় উনি গেলেন জার্মানির যুদ্ধনীতি নিয়ে গবেষণা করতে। খবরের কাগজখানা এলে যেন হুমড়ি খেয়ে তার উপর পড়বে। আর লাইব্রেরী থেকে রোজ রোজ অত বই আনিয়েই বা পড়া কেন? মেয়েমানুষে দিবারাত্রি বই কাগজ নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকলে ঘর-দুয়োরের এমনই ছিরি চাঁদ হয় বটে।" (পৃঃ ৩৪৬)

(চ) 'সেলায়ের কল' গল্পে নিতাইয়ের অনিমাকে উপলক্ষ করে পুরুষজনোচ্চিত উক্তি হলো—

"দুপয়সার উপার্জ্জন করতে শিখলেই মেয়েদের এমন বাড় হয় বটে।" (পৃঃ ৪৪০)

(ছ) অতিথি গল্পে রাখালবাবুর প্রতিমাকে উপলক্ষ করে 'পুরুষজনোচিত উক্তি হলো—

"এক পেয়ালা চা দেবে তার এত লেকচার কেন? আর মেয়েমানুষে খাটবে, সেটা আর এমন নূতন কথা কি? যখন স্রেফ একটি পয়সা দাবি না করে

তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম, সে তো এই যে বড় সড় মেয়ে এসে ঘর-গেরাস্থালীর কাজকর্ম্ম করবে। নইলে মনেও ক'রো না যে তোমার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম, বা তোমার কেতাবি বিদ্যার বহর দেখে ভুলেছিলাম, সে-পাত্র আমি নই। অমন আই-এ বি-এ পাস করা মেয়ে আজকাল গণ্ডায় গণ্ডায়, যেদিকে দু-চোখ চাও।" (পৃঃ ২৫৯)

উপরোক্ত প্রতিটি গল্পের পুরুষের ভাষায় রয়েছে নারীর প্রতি আধিপত্যের ছবি।

অন্যদিকে আশালতার গল্পে সেকালের মেয়েদের কথার ধরণ কিছুটা লক্ষণীয়। যেমন—

(ক) 'মেয়েমানুষ' গল্পে ১৫ বছরের আনুর বিয়েকে কেন্দ্র করে তরঙ্গিণী পিসীর মুখে শোনা যায় নারীজনোচিত উক্তি—

"তা বেশ হয়েছে আনুর মা। বেটা ছেলের আবার বয়স কি, এতদিন পরে যে আনুর বিয়ের ফুল ফুটল সেই সর্বরক্ষে। আমার তো ভাবনায় রাত্রিতে ঘুম হ'ত না মা। সময়ে বিয়ে দিলে তিন চার ছেলের মা হ'ত এতদিনে।" (পৃঃ ৩৩৭)

(খ) 'বান্ধবী' গল্পে মালতীর মা নিস্তারিণীর মালতীকে উপলক্ষ করে নারীজনোচিত উক্তিটি হলো—

"সেইকালেই বলেছিলুম, মেয়েকে ইস্কুল-কলেজে অত পড়িয়ে কাজ কি বাপু? কেন আমরা ক'টা পাশ দিয়েছি? ঘর-সংসার কি ক'রছিনে? তা ছাড়া

মাসে এই যে, এক কাঁড়ি ক'রে টাকা গুণতে হ'চ্ছে— এ কেন, তা শুনি? মেয়ে কি রোজগার ক'রে খাওয়াবে? না, তার বিয়ের সময় আর এক কাঁড়ি টাকা লাগবে না? শুধু শুধু টাকাগুলোর না' হক শ্রাদ্ধা।" (পৃঃ ২৩৯)

(গ) 'বদলে' গল্পে রেখার মার রেখাকে উপলক্ষ করে বলেন—

"তার মা ঠাকুরদের কাছে পাঁচটি পয়সা মানত করে করজোড়ে মনে মনে প্রার্থনা করলেন, ওসব অদল বদলে কিছু যায় আসে না ঠাকুর। কথায় বলে মেয়েমানুষের মন নয় তো যেন জল, যে পাত্তরে রাখবে তেমনই ধারা হবে। এখন ভালয় ভালয় কর্ত্তার ছুটি ফুরোবার আগে ভালো ঘর বর একটি জুটে যায়।" (পৃঃ ১২১)

(ঘ) 'যাত্রা' গল্পে শশাঙ্কের নবগতা বৌকে শাশুড়ী জয়ন্তীদেবীকে বলতে শোনা যায়—

"দেখ বাছা! তোমার তপস্যার জোর ছিল তাই এমন ঘরে এমন বংশে পড়েছ; কিন্তু শুধু তাতেই হয় না, তার যোগ্য হওয়া চাই। এমন হাঘরের মত ধরণ-ধারণ যে তোমার হবে, আমার ছেলের বৌ হাতের কব্জিতে ঘড়ি আঁটবে, একঘর বেটাছেলের সামনে ঘোমটা খুলে ফর-ফর করে ইংরাজীতে বুক্‌নি ছাড়বে, দিনের বেলায় সকলের সামনে স্বামীকে দেকেও স্বচ্ছন্দে মাথার কাপড় খুলে বসে থাকবে, — এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি! তা যদি

পারতাম, তাহলে মরে গেলেও ওখানে ছেলের বিয়ে দিতাম না।" (পৃঃ ৩৬৩)

এছাড়াও আশালতা শহরে থাকা আধুনিক, শিক্ষিতা নারীর মুখের ভাষাও যথাযথভাবে তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। যেমন—

"সুরমা সংযম' গল্পে সুরমাকে হরলালের উদ্দেশ্য বলতে শোনা যায়—

"আমি যে পুরোপুরি স্বাধীন সেইজন্যই যে আমাকে বেশী করে সংযমের বন্ধন মেনে চলতে হয়। শুধু রাত এগারোটা কেন, সারারাত্রি বসে তোমার সঙ্গে গল্প করলেও আমার স্বামী কিছুই মনে করবেন না— কিন্তু জিনিষটা সুন্দর নয় এবং সবদিক দিয়েই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। অতএব এবার তুমি বাড়ী যেতে পার।" (পৃঃ ৪১০)

'সুখবাদ' গল্পে আধুনিক, শিক্ষিতা দীপ্তিকে জিতেনবাবুকে মেয়েদের খদ্দর পড়া পাপ বোঝাতে গিয়ে বলতে শোনা যায়—

"তাছাড়া বুঝিয়ে বললেই কি বুঝতে পারবেন? যদি আমি বলি আপনি একটি চমৎকার ছোটগল্প লিখে যা আনন্দ পান আমি বিকেলে গা ধুয়ে যখন আমার নরম রেশমের মত ধব্‌ধবে সাদা শাড়িশানি পরি, প'রে সূর্য্যাস্তের সোনালি আলোর সামনে এসে দাঁড়াই তখন ঠিক সেইরকমই আনন্দ পাই। যদি বলি সে সময় যদি খদ্দর পরতে হো'ত তাহ'লে সে আনন্দের এক কণাও অবশিষ্ট থাকত না। আপনি বিশ্বাস কোরবেন এই কথা? কিন্তু আমার পক্ষে

তা-ই সত্যি।" (পৃঃ ৩৬৩)

"স্বাধীনতা ও সম্মান' গল্পে বাসে উঠা দুটি মেয়ের মুখের কথা—

> *"একজন বন্ধু উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা করে দিতে চাইলে। কিন্তু সুশ্রী মেয়েটি চটপট ইংরাজীতে বলে উঠল, "দুঃখিতা মেয়ে বলেই সে অন্যকে উঠিয়ে সম্মানের দাবী করে জায়গা নেব আমরা তার পক্ষপাতী নই, আমরা শিভ্যল্‌রি চাইনে, কারণ আমরা তা মানি না। শিভ্যল্‌রি আউর অফ্ ডেটা। আমরা মেয়ে পুরুষের সমান অধিকার এবং সমান দাবীর অনুমোদন করি।"* (পৃঃ ১২৬)

'বিরহ' গল্পের মণিমালার উক্তি—

> *"আজ তোমার মনটা দেখছি আইডিয়ালিজমের চরমে উঠেছে। পৃথিবীর মাটি ছাড়িয়ে পক্ষবিস্তার করে বহু ... বহু দূরে সে ছুটেছে। আচ্ছা, তোমার কথাতেই রাজী, আমরা আধুনিকা নারী, পুরুষের স্বপ্নে বাধা দিয়ে হাতাবেড়ির পাকে তাকে বাঁধিনে।"* (পৃঃ ৫০৩)

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প সম্পর্কে বলেছিলেন—

"ছোট প্রাণ, ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,"

আশালতার ছোটগল্পের ভাষা তেমনি নিতান্ত সহজ সরল হলেও গল্পে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দ বা বাক্যের প্রয়োগ আশালতার ভাষাশৈলীর অন্যতম

বৈশিষ্ট্য। নিম্নে আশালতার গল্পে ব্যবহৃত ইংরাজী ভাষার প্রয়োগ দেখা যেতে পারে। যেমন—

(ক) 'অভিমান' গল্পে কিরণকে বলতে শোনা যায় ইংরাজী বাক্য।

> *"... জীবন বড় না সাহিত্য বড়? কিরণ হাসিয়া ফেলিয়া কহিয়াছিল, কোনটা বড় জানি না কিন্তু আজকাল আমাদের জীবনটা এমনই সাহিত্যিক ছাঁচে গড়িয়া উঠিতেছে যে আকাশে পুঞ্জপুঞ্জ মেঘ দেখিলেই আওড়াইতে বসি "মেঘলোকে ভবতি সুখিনোপি ... এবং কালবৈশাখীর ঝড় দেখিলেই কেনা আমার তৎক্ষণাৎ বলিয়া থাকি,* ***make me they lyre even as the forest is."*** (পৃঃ ৮৪)

(খ) 'নিরুপম' গল্পে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত নিরুকে বলতে শোনা যায় 'অল্‌কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট বইয়ের বীরেন নামে ছেলেটির মত, ***"I won't die, I won't die"*** (পৃঃ ১১৪)

(গ) 'অন্তর্দ্ধান' গল্পে ইংরেজী শব্দের ব্যবহার। যেমন— 'স্পিরিচ্যুয়ালিটি', '**Omnipotent**', 'এ্যাফিনিটি', 'রিয়্যালিষ্টিক', '**Potentially**', '**All-important**', '**Afterall**', '**Auto-suggestion**', চ্যালেঞ্জিং প্রভৃতি। 'অন্তর্দ্ধান' গল্পে লেখক অজিতকে বলতে শোনা যায়, "অসিতা, তুমিই একমাত্র স্থির নক্ষত্র আমার জীবনে। তুমিই শুধু '**above the battle**'।

(ঘ) 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল' গল্পে ব্যবহৃত ইংরাজী শব্দ। যেমন— **'Suggestion', 'Charming', 'Overdose', 'Shallow', 'Horrible', 'Rationalised'** ইত্যাদি।

(ঙ) 'স্পেশালাইজেশান' গল্পের একটি চরিত্র নরেনকে বলতে শোনা

যায়—

"পাঁচ বছর পরে আমি যখন এরোপ্লেনের চালক হইব তখন ... তখন ***It's question of only ten seconds!"*** (পৃঃ ১৫৪)

(চ) 'প্রেমে-পড়া' গল্পে দেখা যায়—

*"নিরুপমা যদি বল্‌ত "আচ্ছা, ভাই অলকা, ব্যবসার বাজার এত মন্দা হ'লো কেন? জগত জুড়ে এত বড় **economic depression** এর কারণটা কি দুর্ব্বোধ্য!"* (পৃঃ ২১২)

বা নিরুপমাকে অলকার উদ্দেশ্য বলতে শোনা যায়—

*"জানইত ভাই আমাদের মনের বিচিত্র ব্যবহার। কী থেকে তার যে কী মনে পড়ে যায় ঠাহর করতে পারি নে। ... আর কাল যে রবীন্দ্রনাথের গানটা গাইছিলে 'আমার পরাণ যারে চায়, তুমি তাই, তুমি তাইগো।' **It is really heart breaking!** তুমি গানে যে কী রকম প্রাণ ঢেলে দাও! আচ্ছা সত্যিই কি তা নিজে বুঝতে পারো না?"* (পৃঃ ২১২)

বা নরেশ নামে আরেকটি চরিত্রের কথা—

*"এ প্রশ্নের উত্তর শক্ত। এবং অনেক রকম, অনেক না লিখে থাকতে পারে না! **They must follow their demon**— কিন্তু আমার ব্যক্তিগত মত যদি জিজ্ঞেস কর তা'হলে বলব মানুষের জীবন যখন*

পরিপূর্ণ হয়ে উঠে প্রতিদিনের জীবনকে ছাপিয়ে যায় তার চিন্তার প্রচুরতা—" (পৃঃ ২১৭)

'অপমান' গল্পে আভা মুখে শোনা যায়—

"Really Deep, you are so horribly humourous!" (পৃঃ ২৩৩)

'রমা' গল্পে দেখা যায় খদ্যোত রমার কথায় **'ugly'** দিয়ে বাক্যগঠন করে বলে— **"ugliness of a woman depends mainly on her dress."** (পৃঃ ২৬৬)

গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র রমার ল্যাণ্ডস্কেপের ছবি আঁকা নিয়ে রমার সহপাঠী মমতাকে ইংরাজী বলতে শোনা যায়— **"Dull! Exceedingly dull!"** এখানে বলা যেতে পারে ইংরাজী শব্দ বা বাক্যের প্রয়োগ আশালতার লেখনীকে এক বিশেষ মাত্রা প্রদান করেছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই বোধগম্য হয় সমসাময়িক লেখিকা আশাপূর্ণা ও আশালতার ভাষাভঙ্গিমা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁদের জীবন আলেখ্য অভিনিবেশ করে জানা যায় উভয়ের রচনারীতির ভাষাভঙ্গিমা পৃথক হবার পেছনে রয়েছে তাঁদের ভিন্ন পারিবারিক বাতাবরণ। যে ব্যক্তি যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে তার ওপর ভিত্তি করেই ভাষার বৈচিত্র্য গড়ে ওঠে। ভাষাতাত্ত্বিক ড. রাজীব হুমায়নের মতে,

"আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে, নারী-পুরুষের ভাষা-পার্থক্য শুধু শব্দ পর্যায়ে সীমিত নয়, ধ্বনি রূপমূল, বাক্য ইত্যাকার বিবিধ পর্যায়েরও তা বিস্তৃত। তাছাড়া শুধু শারীরিক কারণে নারী-পুরুষের ভাষায় বৈচিত্র্য আসেনি; ভাষা বৈচিত্র্যের পেছনে

রয়েছে সামাজিক বিধি-নিষেধ, নারীদের মানসিকতা, পুরুষশাসিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্যান্য জটিলতা।"[৫]

আশাপূর্ণা রক্ষণশীল পারিবারিক বাতাবরণে বেড়ে ওঠায় এবং সে পরিবেশে অবস্থিত নারীর প্রাত্যহিক কথোপকথন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন বলেই তাঁর লেখনীতে সহজেই ঘর করে নেয় মেয়েলি ভাষা। অন্যদিকে আশালতা অভিজাত পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠায় তাঁর লেখনীতে মেয়েলি জগতের খুঁটিনাটি অনুষঙ্গ, তাদের ব্যবহৃত শব্দাবলী, তাদের ভাষা একেবারেই চিহ্নমুক্ত। আশালতার কিছু গল্পে সেকালের মেয়েদের কথা বলার ধরন কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। তবে এটা স্পষ্ট সমসাময়িক লেখিকা আশাপূর্ণা ও আশালতা আপন রচনা বৈশিষ্ট্যর জন্য উভয়েই পাঠককুলে চিরস্মরণীয়।

উল্লেখসূত্র :

১. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা— ড০ রামেশ্বর শ, পুস্তকবিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- প্রথম খণ্ড ৮ই ফাল্গুন ১৩৯০, পৃঃ ৩

২. দ্র. ঐ, পৃঃ ৩

৩. **Sturtevant Edgar H : An Introduction to Linguistic Science, New Haven : Yale University Press, 1947, Ch-I**

৪. আশাপূর্ণাদেবী, খেলা থেকে লেখা, আর এক আশাপূর্ণা, ১৪০১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃঃ ৪

৫. হুমায়ুন রাজীব : সমাজ ভাষাবিজ্ঞান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৩, পৃঃ ৪২